কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৪ SEP 2016 পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সুবিধা বাড়লেও কমছে শিক্ষার মান

শরীফুল আলম সুমন ▷

সপ্তম পে স্কেলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা সাকুল্যে বেতন পেতেন প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকা। নতুন পে স্কেলে তাঁদের বেতন বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এখন চাকরির শুরুতেই একজন সহকারী শিক্ষক বেতন পান প্রায় ১৭ হাজার টাকা। নিজের ইউনিয়নেই কিংবা উপজেলার মধ্যেই অন্য কোনো স্কুলে নিয়োগ পান তাঁরা। এতে বেশির ভাগ শিক্ষক নিজের বাড়িতেই থাকার সুযোগ পান। বলতে গেলে বাড়িতে খেয়ে-পরেই চাকরি করতে পারেন তাঁরা। প্রাথমিক শিক্ষকদের সুবিধা দিয়ে ২০১৩ সাল থেকে বড় তিনটি পরিবর্তন এনেছে সরকার। ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে, প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন গ্রেড এক ধাপ উন্নীত করা হয়েছে। নতুন পে স্কেলে বেতনও দ্বিগুণ হয়েছে। তবে দিন দিন শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও পিছিয়ে যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার মান।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) সূত্র জানায়, দেশে এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩ হাজার ৮৬৫টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় এক কোটি ৯৫ লাখ। আর শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় চার লাখ। এই শিক্ষকদের মধ্যে বিশেষ করে দেড় লাখের যোগ্যতা-দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে।

শিক্ষার মান বাড়াতে তদারকির দায়িত্ব যাঁদের, সেই প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারাই জড়িয়ে পড়ছেন নানা অনিয়মে। পরিদর্শন ব্যবস্থাও নড়বড়ে হয়ে গেছে। অভিযোগ রয়েছে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের

▶▶ পৃষ্ঠা ৭ ক. ১

সুবিধা বাড়লেও কমছে শিক্ষার মান —

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

(এটিও) টাকা দিলে একজন শিক্ষকের নিয়মিত স্কুলে হাজিরা না দিলেও চলে। অনেক স্কুলের শিক্ষকরাই ভাগাভাগি করে চাকরি করছেন। অনেক ক্ষেত্রে বহিরাগত কাউকে টাকা দিয়ে ক্লাসে পাঠাচ্ছেন তাঁরা। স্কুলের নির্দিষ্ট সময়সূচিও মানেন না অনেক শিক্ষক। শিক্ষা কর্মকর্তাদের টাকা দিয়ে পার পেয়ে যান তাঁরা। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে (পিইসি) ফল জালিয়াতির সঙ্গেও কর্মকর্তাদের জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠেছে। রাজধানীর মিরপুরের সাতটি স্কুলে কয়েক বছর ধরেই টাকার বিনিময়ে ফল পরিবর্তন করা হচ্ছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাই এ কাজে সহায়তা করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি পেতে নারী প্রার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে স্নাতক পাস হলেই চলে। জানা যায়, বেতন কম থাকায় এক সময় মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রাথমিকের শিক্ষকতায় আসতে চাইতেন না। তবে নতুন পে স্কেলের পর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদেরও এ চাকরির প্রতি আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু প্যানেলভুক্ত ২৮ হাজার প্রার্থীকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়ার চলমান প্রক্রিয়ার কারণে শূন্য পদের অনেকাংশই ইতিমধ্যে পূরণ হয়ে গেছে। এ ছাড়া পুলভুক্ত ১৫ হাজার শিক্ষক রয়েছেন, যাঁরা প্যানেল শিক্ষকদের মতোই নিয়োগ পেতে চান। তবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওই প্যানেল ও পুল করা হয়েছে ২০১২ সালে। সে ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের তুলনায় প্যানেল ও পুলভুক্তদের যোগ্যতা অনেক কম। ২০১৩ সালে সরকার একযোগে ২৬ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করলেও এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানও অনেকটা প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে একদিকে মেধাবীদের ঢোকার পথ বন্ধ, অন্যদিকে জাতীয়করণ করা স্কুলগুলোর শিক্ষকদের নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় প্রাথমিক শিক্ষার মানেও বড় ধরনের ধস নামার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

চলতি বছর প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদনেও প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষকদের মান নিয়ে হতাশার চিত্র ফুটে ওঠে। 'রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন' (রেস)-এর গবেষণায় বলা হয়, প্রাথমিকে ১৩ শতাংশ শিক্ষক পুরোপুরি সৃজনশীল বা যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্ন বোঝেন না। শিক্ষকদের ৪২ শতাংশ সীমিত পরিসরে নিজেরা বুঝলেও ক্লাসে বোঝাতে পারেন না। সৃজনশীল না বোঝায় ৪৭ শতাংশ শিক্ষক বাজারের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভর করেন। বাকিদের মধ্যে ৩৫ শতাংশ সহকর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে এবং

দেখেন না। যে শিক্ষক যে বিষয়ে পড়াবেন সে বিষয়ের ওপর তাঁর জ্ঞান থাকতে হবে, পড়ানোর পদ্ধতিও জানতে হবে। কিন্তু বর্তমানে তাও ঠিকমতো নেই। তাই আমরা মানে উন্নতি করতে পারছি না। বর্তমান নিয়োগ পদ্ধতি প্রশংসার দাবি রাখলেও এর বাইরেও নিয়োগ পেয়ে যাচ্ছেন অনেক শিক্ষক। তাই বিদ্যালয়গুলোতে মনিটরিং বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্যও বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এতে পাস না করলে ইনক্রিমেন্ট হবে না। এটা চালু হলে শিক্ষকরা উদ্যোগী হবেন। এখন বেতন বেড়েছে, তাই শিক্ষকদের আরো কমিটেড হতে হবে। প্রাথমিকে নারী শিক্ষক দরকার, কিন্তু তাঁদের অনেকেই বিদ্যালয়ে নিয়মিত নন। এটারও সমাধান করতে হবে।'

২০১৩ সালে প্রায় ২৬ হাজার স্কুল জাতীয়করণ করা হয়। এসব স্কুলের বেশির ভাগ শিক্ষকের মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, এসব বিদ্যালয় বেসরকারি রেজিস্টার্ড থাকার সময় শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ। ওই শিক্ষকদের বেশির ভাগেরই নিয়োগ পাওয়া ২০১১ সালের আগে। সে সময় শিক্ষক পদে নারী প্রার্থীদের জন্য যোগ্যতার শর্ত ছিল মাধ্যমিক পাস, পুরুষদের ক্ষেত্রে ছিল উচ্চ মাধ্যমিক। অভিযোগ রয়েছে, পরিচালনা পর্ষদকে টাকা দিয়েই নিয়োগ পেয়েছেন বেশির ভাগ শিক্ষক। তাঁদের বেশির ভাগেরই প্রশিক্ষণ নেই। প্রাথমিকের চার লাখ শিক্ষকের মধ্যে জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা এক লাখের ওপরে।

২০১২ সালে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য ৪২ হাজার প্রার্থীর সমন্বয়ে প্যানেল করা হয়। তবে ২০১৩ সালে স্কুলগুলো সরকারি হয়ে যাওয়ায় এ তালিকায় থাকা ২৮ হাজার প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। আদালতের আদেশের মাধ্যমে তাঁরা সম্প্রতি নিয়োগ পেয়েছেন। এই প্যানেলে থাকা শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, অনেকেই টাকার বিনিময়ে প্যানেলে ঢুকেছেন, যাঁরা এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

এ ছাড়া ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে এসএসসি ও সমমান পাস করা প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক রয়েছেন দেশের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তখন এসএসসিতে ৫০ নম্বরের রচনামূলক ও ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা নেওয়া হতো। তবে প্রতিটি বিষয়ের ৫০০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল। সেখান থেকেই ৫০টি প্রশ্ন আসত। ওই পাঁচ বছরে রচনামূলকে আলাদাভাবে পাস করার শর্ত ছিল না। কেবল নৈর্ব্যক্তিকে পাস করলেই

১৮ শতাংশ নিজেদের ধ্যানধারণা থেকে পড়ান।

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের ২০১৫ সালের 'এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টে'ও ধরা পড়েছে শিক্ষকদের যোগ্যতার ঘাটতি। তাতে বলা হয়েছে, ১৯৯৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে [illegible] শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৪৬.[illegible] শতাংশ, ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৭.২ শতাংশে। তবে নতুন জাতীয়করণ করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ হার মাত্র ২৬.১ শতাংশ এবং উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে মাত্র ৮ শতাংশ। আর এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেশির ভাগ মাদ্রাসা থেকেই পড়ালেখা করেছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষকই মানবিক বিভাগ থেকে পাস করা। ২০১৪ সাল পর্যন্ত মৌলিক প্রশিক্ষণ (সিইনএড, বিএড, এমএড) প্রশিক্ষণ ছিল ৬৫.৯ শতাংশ শিক্ষকের। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের গুরুতর ঘাটতি লক্ষ করা গেছে কিন্ডারগার্টেন ও এবতেদায়ি মাদ্রাসায়। কিন্ডারগার্টেনে প্রশিক্ষিত শিক্ষক আছেন মাত্র ১৫ শতাংশ, এবতেদায়ি মাদ্রাসায় [illegible] ৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ছিল ৮৯.৩ শতাংশ, আর যথাসময়ে উপস্থিতির হার ছিল ৬৬.১ শতাংশ। দেরিতে উপস্থিতির হার বেশি ছিল মাদ্রাসা ও জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়ে।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব ভবন রয়েছে, খেলার মাঠও আছে। অবকাঠামোও উন্নত। তা সত্ত্বেও সরকারি চাকুরেরাই তাঁদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিকে পড়ান না। এমনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও তাঁদের সন্তানদের পড়াচ্ছেন কিন্ডারগার্টেনে। চলতি মাসের শুরুতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) এক প্রজ্ঞাপনে সরকারি কর্মকর্তাদের সন্তানদের সরকারি প্রাথমিকে পড়ানোর বাধ্যবাধকতা রেখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। কিন্তু আদেশ জারির কিছুক্ষণ পরেই তা বাতিল করা হয়। এতেই বোঝা যায়, শিক্ষা অধিদপ্তরও সরকারি প্রাথমিকের শিক্ষার মান নিয়ে সন্তুষ্ট নয়।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেসকোর এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল ব্যুরো ফর এডুকেশনও গত বছরের শেষের দিকে এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবেই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। এ দেশে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার মাত্র ৫৮ শতাংশ। অথচ নেপালে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের হার ৯০, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় ৮২, মালদ্বীপে ৭৮ শতাংশ এবং মিয়ানমারে শতভাগ শিক্ষকই প্রশিক্ষিত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৩ শতাংশ শিক্ষক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে মনিটরিং যথাযথ হচ্ছে না। শিক্ষকরা রেগুলার কি না, তাঁরা প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে যান কি না [illegible] এটিও [illegible] দেখেন। [illegible] [illegible] বলে শিক্ষকদের পড়ানোর ধরনও

চলত। [illegible] আছে, [illegible] শ্যাতক [illegible] শিক্ষার্থীর পক্ষেও এসএসসি পাস করা সম্ভব ছিল। সে সময় এসএসসি পাস করা অনেকেই এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করছেন। সব মিলিয়ে প্রায় দেড় লাখ শিক্ষকের যোগ্যতার [illegible] ধরনের ঘাটতি রয়েছে।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সরকারি প্রাথমিকের সঙ্গেই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি খোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। কিন্তু প্রাথমিকের বর্তমান শিক্ষকরা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতে পারবেন কি না তা নিয়েও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এখনো প্রায় অর্ধেক শিক্ষক মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পাস। আর জাতীয়করণ করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুই-তৃতীয়াংশই এসএসসি বা সমমানের পাস করা, যাঁদের পক্ষে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়ানো সম্ভব নয়।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাতারাতি প্রাথমিক শিক্ষার মান বৃদ্ধির আশা করা যায় না। তবে এখন কিছুটা হলেও সুবিধা বেড়েছে। আশা করছি, মেধাবীরা আসবে, মানেরও উন্নতি হবে। আর এখন বিশেষ করে জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় ও প্যানেল থেকে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের দ্রুত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া শিক্ষকরা ভালো করলে পুরস্কার আর খারাপ করলে তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। উন্নত বিশ্বে শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি মূল্যায়ন হয় শিক্ষকদের।'

রাজধানীর হাজারীবাগ সরকারি বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম ছায়িদ উল্লা বলেন, 'জাতীয়করণ করা বিদ্যালয় ও প্যানেল থেকে আসা শিক্ষকরা দক্ষতার দিক দিয়ে ঠিকমতো তাল মেলাতে পারছেন না, এটা ঠিক। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ জন্য পুরনো স্কুলের শিক্ষকদের নতুন স্কুলে দিয়ে কিছুটা চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর পরও সব স্কুল এক কাতারে আসতে সময়ের প্রয়োজন। স্কুলগুলোতে মনিটরিংও ভালো নয়। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। তাঁরা একাডেমিক কর্মকাণ্ড মনিটরিংয়ের দিকে তেমন কোনো নজর দেন না। তাঁরা শুধু প্রশাসনিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সব ক্ষেত্রেই তাঁদের অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে।'

ডিপিইয়ের মহাপরিচালক মো. আলমগীর কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার মান বাড়াতে সময়ের প্রয়োজন। তবে এ জন্য আমাদের শিক্ষকদেরও দক্ষ হতে হবে। এমডিজির (সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) শর্তানুযায়ী আমাদের টার্গেট ছিল শতভাগ শিশুকে স্কুলে আনা, সেটা আমরা পেরেছি। এবার এসডিজির (টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) টার্গেট অনুযায়ী মান বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছি। চাকরি পেতে নারী শিক্ষকদের যোগ্যতা স্নাতক করার বিষয়েও আমরা কাজ করছি। প্যানেল প্রার্থীদের নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন কোর্ট। আমরা আদেশ মেনেই নিয়োগ দিয়েছি। এখানে আমাদের বলার কিছু নেই। তবে প্যানেলভুক্ত ও জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের [illegible] প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'